মেটিয়াবুরুজের কারখানা শ্রমিক

জিতেন নন্দী

বারো বছর বসবাস করে বাঁধাবটতলা ছেড়ে যাচ্ছি। জনবহুল মোড়টা সাইকেলে পার হতে হতে কথাটা মনে এল। এই যে এখন গলির মুখ পেরিয়ে মোড়টা ভর সন্ধেয় গমগম করছে, কেবল ভিড় আর ভিড়—গলির ভিতর দাওয়ায় বসে যেখানে সাট্টার স্লিপ কাটা হচ্ছে, তারপর বিজনদার হোটেল, বিজনদার তেলেভাজার দোকান, আলুকাবলিওয়ালার ডালা, গলি পেরিয়ে রাস্তার ওপর ফলের দোকান, গামছার দোকান, মেয়েদের সায়া-ব্লাউজের দোকান, ধূপের দোকান ঘিরে বিক্রিবাটার টানটান ব্যস্ততা এখন, আমাকে বেশ কসরৎ করে সাইকেলটা এপাশ-ওপাশ গাড়ি-মানুষ-ছাগল সবাইকে পাশ কাটিয়ে বার করে নিতে হচ্ছে, এই এখান এই-আছি, এই-নেই। তারপর সেই আক্রা ফটকের রবীন্দ্রনগরে নতুন আস্তানা, অনেকটাই শান্ত জীবন। যেখানে দিনের কোনো সময়ই এই বাঁধাবটতলার মতো গমগম করে না, সেখানে চলে যাব বাসাবদল করে।

আমাদের কেবল যাওয়া আর আসা। টালিগঞ্জ থেকে কালিঘাট, কালিঘাট থেকে দুর্গাপুর, দুর্গাপুর থেকে বেহালার এপাড়া-ওপাড়া, পাঁচ-সাতটা পাড়ায় বাসবদল করতে করতে অবশেষে এসেছিলাম বাঁধাবটতলায়।

আমাদের আজন্ম কোনো পাড়া নেই, গ্রাম নেই, দেশের বাড়ি নেই। আমরা যখন পশুপালক জিপসিদের মতো আস্তানা বদল করি, আমাদের জন্য কেউ কাঁদে না। কেবল আমাদের প্রাণের ভিতরটা কাঁদতে থাকে, অন্তত আমার তো কাঁদে। আমি কোনো কাজের অছিলায় বেহালা বা কালিঘাটের গলির মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে সাইকেল চালিয়ে ঘুরতে থাকি, পরিচিত ঘর-বাড়ি-ক্লাব, চায়ের দোকান, কারখানা আর মানুষগুলোকে খুঁজতে থাকি। কেউ হয়তো চিনতে পেরে এগিয়ে এসে বলে : বিদ্যুৎ না? আরে! কী খবর? দু-চারটে কথাতেই আমি খানিক অক্সিজেন পেয়ে যাই বাঁচবার। সাইকেলটার স্পীড বেড়ে যায়।

আমার জীবনের বড়ো সময়টাই শ্রমিক খুঁজে ফেরা। কারখানার গেট, গেটের মুখে চায়ের দোকান, স্টেশন চত্বর, তথাকথিত আণ্ডারগ্রাউন্ড শ্রমিকের আস্তানায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে বাঁধাবটতলার এই বাবুদের গলিতে। এখানে বাড়িওয়ালা থেকে অন্য ভাড়াটে, প্রতিবেশী প্রায় সকলেই শ্রমিক। এর আগেও অবশ্য বেহালায় এক পোর্ট শ্রমিকের বাড়িতে থেকেছি, যাঁদের সঙ্গে ঘরভাড়া নিয়ে একসঙ্গে থাকতাম তাঁরাও ছিলেন শ্রমিক। এছাড়া, বাড়িওয়ালা হিসেবে পেয়েছি এক মিল্ট শ্রমিককে, আর এক জায়গায় রেশন দোকানের এক কর্মচারীকে।

সেদিন এখানে মুদিয়ালীর এক সাহিত্য-সভায় অবশ্য একজন কলেজ-পড়ুয়া মেয়ে সটান প্রশ্ন তুলল : 'শ্রমিক আমরা কাকে বলব?' আমি জানি না ওর বাবা কোনো কারখানা-শ্রমিক কিনা। আমি ওকে সেকথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। কি জানি, করলে ও হয়তো চটেও যেতে পারত। পরে জেনেছি ওর বাড়ি লালাবাগানে, সেও এক শ্রমিক-পাড়া।

শ্রমিক পরিচয়টা অনেকেই দিতে চান না, বিশেষ করে বড়ো কারখানার শ্রমিকেরা। অনেক শ্রমিককে দেখেছি কারখানায় কাজের জায়গা বদল করে অফিসে বা স্টোরে পিওনের কাজ পাবার জন্য ম্যানেজারদের বা অফিসারদের তদ্বির করেন। কারখানার শ্রমিক-নেতাদের বয়লার-স্যুট গায়ে চাপিয়ে প্রোডাকশনের কাজ—বিশেষত গায়ে-গতরে কাজ করতে না চাওয়ার গল্প তো বহুল পরিচিত। অনেক কসরত করে ওয়ার্কার থেকে স্টাফ হয়ে হয়তো বউয়ের হাতে সাজা একটা পান চিবোতে চিবোতে সকালে ডিউটিতে বেরোন। হাতে থাকে রেক্সিনের ফোলিও ব্যাগ। শ্রমিকের মতো কাপড়ের থলিতে টিফিন কৌটোটা রেখে হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সাইকেল চালানো তো আর মানায় না। ছেলেকে তাঁরা ভর্তি করে দেন খিদিরপুরের সেন্ট টমাস স্কুলে। তার জন্য কয়েক হাজার টাকা ঘুষ দিতেও পিছপা হন না। আবার হয়তো সংসারের টানাটানির জন্য মেয়েকে পড়া ছাড়িয়ে দেন। কিংবা নতুন পাওয়া স্ট্যাটাস সামলাতে হয়তো মাসের শেষে দেহাতী শ্রমিকভাইয়ের কাছে গিয়ে হাত পাতেন। পাঁচ পার্সেন্ট মাসিক সুদে ধার নিয়ে সংসার সামলাতে হয়। 'টমাসাইট' ছেলেও হয়তো পরে জেরক্স-এর দোকান অথবা ছোটখাট ব্যবসায় লেগে যায়। হয়তো কলেজ অবধি ভাল করে পড়া হয় না। 'টমাসাইট' কথাটা সেদিন একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনে দেখতে পেলাম। বেকার ছেলেরা টিউশন করতে চায়,

বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কোয়ালিফিকেশন হিসেবে প্রথমেই লিখেছে : 'Ex-Thomasite students will coach students in English medium. Please contact at...'

আমি ওবিসি, আমি সিডিউল্ড কাস্ট, আমি প্রতিবন্ধী বললেও কিছু সুবিধে চেষ্টা করা যায়। শ্রমিক পরিচয়ের কোনো ফায়দা নেই, অন্তত আজ, এই 'ঐতিহাসিক' শ্রমিকাঞ্চলে। শ্রমিক মানে শুধু অপমান আর লাঞ্ছনা!

শ্রমিক শ্রমিক-জীবনের ক্লেদমুক্ত হবার তাগিদে গান শিখে গানের মাস্টার হন, কবিতা লিখে কবি হন, হোমিওপ্যাথি শিখে ডাক্তার হন, সাংবাদিকতা করে সাংবাদিক হন, আরও কত কী-ই না হয়েছেন। সেসব তকমার জন্য মেহনত তো কিছু কম হয় না ওঁদের। আমাদের চোখের সামনে এই কাঁধাবতলায় তাঁদের চলা-ফেরা করতে দেখি। এলিট-সমাজে পাত্ত পেতে গিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও সইতে হয় অনেক সময়। কেউ তাতে অপমানবিদ্ধ হন, কেউ হন না। তবে কখনো কখনো এই বিষাদময় টানাপোড়েনের মাঝে রুপোলি-রেখার মতো বেজে ওঠে সৃষ্টির সুর। জি ই সি কারখানার এক শ্রমিক তো আত্মজীবনীমূলক একটা উপন্যাসও লিখেছেন ইদানীংকালে : বজবজের গ্রাম থেকে এসে মেটিয়াবুরুজের বস্তিতে ঠাঁই নেওয়া এক ক্যাজুয়াল শ্রমিক-জীবনের নগ্ন সে-বিবরণী। তবু শ্রমিক পরিচয় কুণ্ঠার, অপমানের, লুকিয়ে রাখার।

একটা ঘটনা ঘটেছিল। গার্ডেনরীচ জাহাজ কারখানার এক প্রাক্তন শ্রমিকের লেখা একটি উপন্যাস পড়ে লেখকের পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম তাঁরই প্রতিবেশী আমার এক বন্ধুর কাছে। শ্রমিকদের জলজ্যান্ত বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের উপর লেখা উপন্যাস। লেখক নিজে কি শ্রমিক ছিলেন? এই প্রশ্ন করাতে আমার বন্ধু বললেন : 'কারখানায় চাকরি তো করতেন জানি। তবে শ্রমিক ছিলেন কিনা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করব? উনি যদি কিছু মনে করেন?...'

* * *

এই তো সেদিন, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রামানন্দ সিং-এর সঙ্গে। ওঁর সঙ্গে সারা দুপুরটা কাটল। ওঁর এখন অখণ্ড অবসর। সাবান-কল লকআউট হয়েছে তিনমাস আগে। ফলে অনেকটা সময় আড্ডা হলো। রামানন্দ এখন ইউনিয়নের একজন সাধারণ সদস্য, আগে কিছুদিন লিডারি করেছেন। তাছাড়া, 'লিডার' নামটা তাঁর পাড়াতেও ছিল একসময়, এমনকী ওঁর বউও ওঁকে 'লিডার' বলেই সম্বোধন করতেন। ওঁর কাছে শুনলাম লকআউটের জন্য একটা বিয়ে স্থগিত হয়ে যাওয়ার গল্প। মেয়েটার নাম অমিতা, ওঁকে মামা বলে ডাকে। ওঁরই প্রতিবেশী পোদ্দার সুতাকলের এক শ্রমিকের মেয়ে। বিহারী মামার আদরের বাঙালি ভাগ্নী। পোদ্দার ছ'বছর লকআউট। রামানন্দ মেয়েটার জন্য একটা সুপাত্র দেখেছেন। ছেলেটা ওঁর কারখানারই কনট্রাক্ট শ্রমিক। এখানে একা অস্থায়ীভাবে থাকে, বাবা-মা আর ঘরবাড়ি জায়গা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামে রয়েছে। ঠিকা শ্রমিক ছেলে, তার সঙ্গতি কম। মেয়ের বাবার সঙ্গতি একেবারেই নেই। এদিক ওদিকে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে কোনো মতে সংসারটা ঠেকা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি, মেয়ের বিয়ের জন্য একপয়সা খরচ করার সাধ্য নেই। রামানন্দ রামদাসহাটির এপাড়ায় এসেছেন মাত্র ক'বছর। এখানে 'লিডার' হিসেবে নামডাক আর ততটা নেই। তবে পুরনো অভ্যাসের জের রয়ে গেছে। নিজে উপযাচক হয়ে দু-পক্ষকে মোলাকাত করিয়ে দিয়েছেন। তারপর আশীর্বাদও হয়ে গেছে রামানন্দের খরচায়। বিয়ের তারিখ পাকা হয়ে গিয়েছিল। রামানন্দের বউ বলেছিলেন : 'লিডার, আমি কিন্তু বিয়ের লাইট সাজানোর খরচ দেব।' কিন্তু লকআউট হয়ে বিয়েটাই স্থগিত হয়ে গেল।

রামানন্দের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল, উনি থাকতেন মেহেরমঞ্জিলের উর্দুভাষী মুসলমান বস্তির মধ্যে। ওই গলিতেই ডিসি-পোর্ট বিনোদ মেহতা মার্ডার হয়েছিলেন। রামানন্দ সিং, বরাবরই দেখেছি, রাজপুত অভিমানে ভরপুর। বিহারের জিলা বৈশালীর ঝিটকহিয়া গ্রামে ওঁর আদিবাস। প্রথম যেদিন দেখা হলো, ১৯৮৬ সালে কারখানার ইউনিয়ন নির্বাচনে জিতে রামানন্দ এবং অন্যরা পার্টির লিডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, ওঁর মাথায় ছিল একটা বড়ো সাদা পাগড়ি। আমার দেখে বেশ মজা লেগেছিল। ওঁর চেহারাটা ছোটখাট। ওঁর পাশেই ছিলেন বেশ লম্বা চেহারার রামরাজ, মুখে বসন্তের দাগ, জাতে হরিজন। আর এক নিম্নবর্ণের শ্রমিক, বয়সে তরুণ ফিটফাট বেশ আধুনিক হাবভাব—সদাব্রীজ প্রসাদ। ওঁদের তিনজনকে যখন একসাথে দেখতাম, প্রায়শই হাসি-মজাক করতে করতে চলত গ্রামীণ পরিচয়ের লড়াই। বন্ধুত্বও ছিল, আবার অন্তঃসলিলা ধারার মতো বিরোধও ছিল। বিরোধটা আসত কিছু তফাত থেকে, সে-তফাত ওঁরা যত্ন করেই যেন লালন করতে চেয়েছেন—নিজেদের মত, রুচি, চলাফেরা, জীবন-যাপনের মধ্যে। সেদিন ওঁদের দেখেছিলাম একটা আন্দোলনের ভিড়ে। আজ যেন প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব নিয়েই আলাদা-আলাদা বলা যায়।

যেমন, রামানন্দ সিং-এর একটা অন্য ধরনের মাথা-উঁচু বোধ ছিল প্রখর। ইউনিয়নের নেতা হয়ে আসার পর প্রধান চাকরি ছিল। ইউনিয়নের কাজে দেদার খরচা করতেন।

ইউনিয়নের কাজ করতে গিয়ে গেটপাস আর ছুটি নেওয়ার ঠেলায় পে-স্লিপে অর্ধেক মাইনে কাটা চলে যেত। মাইনের থোক টাকাটা হাতে পেয়ে একবস্তা চাল আর পাঁচ/দশ কেজি আলু সাইকেলে চাপিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিতেন। তবুও লাপরোবাহি ভাবটা বজায় ছিল। তারপর ইউনিয়ন করার ইনাম বাবদ যখন চাকরি চলে গেল, যখন অভাব এল দারুণ, ঘরে গিয়ে দেখতাম বউয়ের চেহারাটা শুকিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েগুলো কষ্টে রয়েছে, পাগড়িটা আর মাথায় নেই, তবু রামানন্দের মাথাটা কিন্তু পাগড়ি পরা-মাথার মতোই তেরছাভাবে উঁচু হয়ে রয়েছে।

আর একবার কারখানার গেটে খুব মারামারি হলো। রামানন্দ-রামরাজরা তখন চার বছর গেটের বাইরে। দালালদের প্রচণ্ড উৎপাত চলছে কারখানায়। আর শ্রমিকেরা ভিতরে নেতৃত্বহীন অবস্থায় খুবই ভয় পেয়ে রয়েছেন। বহুজাতিক কোম্পানি, খুবই বেপরোয়া আর মারমুখী। দালালরা ইউনিয়নকে গেটে মিটিং পর্যন্ত করতে দেবে না। মারামারির পর গেট থেকে সরে এসে আটাশ নম্বর পুলিশ ফাঁড়ির কাছে রাস্তা অবরোধ করা হলো। মেহেরমঞ্জিল, বাত্তিকল থেকে শ্রমিক-পরিবারের মেয়েরাও এসে সাথ দিল। তবে বেশিক্ষণ নয়। প্লেন ড্রেসে হান্টার শু পরা একদল পুলিশ ট্যাকসি চেপে এসে নামল। একটু দূরে থেমে এসেই প্রচণ্ড লাঠিচার্জ করল, গ্রেপ্তার করা হলো অনেককে। পুলিশ আসার আগে রামানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'পুলিশ এসে যদি লাঠি চালায় আমরা কী করব?' আমি বলেছিলাম : 'আমরা শক্ত হ'য়ে দাঁড়াব, মার খাব।' আমি আক্রমণের মুখে শক্ত হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। রামানন্দ সিং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছিলেন। এক পায়ে যখন লাঠি পড়ল, আর এক পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর একজন খুব মার খেয়েছিলেন, সাহাবুদ্দিন খান। রামানন্দ আর সাহাবুদ্দিনের পরের দিকে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওঁদের আড্ডা ছিল রামনগর মোড়ে।

ওই ঘটনার পরই ম্যানেজমেন্টের কাছে সারেন্ডার করলেন আর এক ছাঁটাই শ্রমিক, মহম্মদ সাগির। দালালদের মারফত রফা হলো ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। সাগির এমনিতে ছিলেন চুপচাপ স্বভাবের, রোগা পাতলা চেহারা। আর বক্তৃতা দিতেন আগুনের মতো। দু-তিন বছর ছাঁটাই থাকা অবস্থায় আরও অনেকেই পরে টলে গিয়েছিলেন। তবে সাগির চলে গেলেন প্রথমেই, কোনো দোনামনা ছিল না।

সাহাবুদ্দিন ছিলেন খুব একরোখা। মুঙ্গেরের উচ্চবংশীয় মুসলমান। মুখে হাতে শ্বেতির দাগ, কোনো কথা শুরুর আগে একচোট হেসে নিতেন। ছাঁটাই থাকাকালীন ঘরে বেশ অভাব, কিন্তু খেতে খুবই ভালবাসতেন। বাঁ হাতে নিঃশব্দে তিন-চার প্লেট বিরিয়ানি সাবাড় করে দিতে পারতেন। কথা বলতেন কম। কিলখানা থেকে হেঁটে রোজ রামনগরে কারখানার সামনে আসতেন। রিয়াজ, আসরাফরা ওঁকে ঠাট্টা করে কখনো কখনো 'খানসাহেব' বলে সালাম করতেন। তবে সত্যিই একধরনের জেদ এবং মাথাউঁচু ভাব ওঁর মধ্যেও ছিল। তার সঙ্গে 'খানসাহেব' পরিচয়ের সম্পর্ক কিছু ছিল কিনা বলতে পারব না।

কারখানায় থাকাকালীন যেটা তেমন ছিল না, ছাঁটাই হয়ে আসার পর সেটা গড়ে উঠল ওঁদের মধ্যে : বন্ধুত্ব। ছাঁটাই হয়ে থাকার সময় রামরাজকে শমীমভাইয়ের বাড়িতে ঢুকে তক্তাপোষের ওপর বসে খেতে দেখেছি পরবের সময়। গোমাংস নয়, সেমুই-পরোটা। আর সাহাবুদ্দিন রামানন্দের বন্ধুত্বটা তো বেশ গাঢ় হয়েছিল। রামানন্দ ছিলেন ইউনিয়নের ট্রেজারার, সকলের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদের লোক। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থেকে পারিবারিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। একবার রামানন্দের বাড়িতে সাহাবুদ্দিন বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন। ওই দুর্দিনের মধ্যেও এসব অল্পবিস্তর চলত। রামানন্দের মুখেই গল্পটা পরে শুনেছিলাম। সাহাবুদ্দিনের বউ রামানন্দদের ওঁদের ঘরে একবার দাওয়াত দিতে চাইছেন। সাহাবুদ্দিনের ছোটো ছেলেটা হঠাৎ বাবাকে বলে বসল : 'আব্বু বহলোগ হামলোগোকে ঘর নেহী আয়েগি, কিঁউকি হমলোগ মুসলমান হ্যাঁয়।' রামানন্দ আর ওঁর বউ খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন। অতএব সাহাবুদ্দিনের ঘরে তখনই ওঁদের নেমন্তন্ন পাকা করতে হলো। নেমন্তন্নের দিন সাহাবুদ্দিনের ঘরে পৌঁছে রামানন্দ আরও অবাক হয়ে গেলেন। সাহাবুদ্দিনের বউ একদম নতুন হাঁড়ি কড়াই থালা আগেভাগে রেডি করে রেখেছেন রামানন্দদের জন্য। সেই নতুন বাসনে রান্না-খাওয়াদাওয়া হলো সেদিন।

আসলে শ্রমিকদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধের এই যে এক একটা রকম দেখতাম, তা সবটা বিশ্লেষণ করতে পারিনি। নিজামুদ্দিন ছিলেন সাহাবুদ্দিনের মতোই আর একজন গরিব, ছাঁটাই শ্রমিক। সাহাবুদ্দিন কনট্রাক্ট থেকে স্থায়ী হবার অল্প ক'মাস পর ছাঁটাই হয়েছিলেন। নিজামুদ্দিন ছিলেন বরাবর কনট্রাক্ট শ্রমিক। 'খানসাহেব' না হয়েও নিজামের চরিত্রের কতগুলো অদ্ভুত গুণ ছিল। সেটা কেবল আত্মসম্মানই নয়, আরো কিছু। নিজাম হিন্দি, উর্দু এবং খুব সামান্য ইংরেজি পড়তে-লিখতে জানতেন। সাহাবুদ্দিন ছিলেন নিরক্ষর, উর্দুটা পড়তে জানতেন কোনোরকমে। কেশোরাম কটন মিলসের

মনে ছিল উর্দুভাষীদের পুরনো হিন্দুস্তান লাইব্রেরি। ওখান থেকে নিজাম রিয়াজের সঙ্গে উর্দু বই এনে পড়তেন। হিন্দি সিনেমা দেখার শখও ছিল, তবে পরের দিকে সঙ্গতিতে কুলোত না।

ছাঁটাই হবার পর বছর খানেক দেখতে না-দেখতে কেটে গেল। কারখানা চত্বর প্রথমদিকে সরগরমই থাকত। একে একে অনেকেই কোনো না কোনো কাজে লেগে গেলেন। নেতৃত্বদায়ীদের মধ্যে শমীমভাই তো ছাঁটাই হয়েই বাজারে আলুর দোকান লাগিয়ে ছিলেন। কেউ ফল বিক্রি করতে লাগলেন, কেউ রিকশা টানতে থাকলেন, কেউ গরমকালে আইসক্রীমের গাড়ি বার করলেন। নিজাম বহুদিন পর্যন্ত কারখানার গেটে লড়াইয়ের ডিউটি দিয়ে গেছেন নিয়মিত। অনেক পরে ধানখেতি বাজারে চপ্পলের দোকান দিয়েছিলেন। তপসিয়া থেকে চপ্পল কিনে আনতেন নিজামভাই, তাতে ঠিক 'Bata'-র মতো ডিজাইন করে 'Bato' লেখা থাকত। রিয়াজ, অফিসারফরা নিজামকে দেখলেই বাটো, বাটো বলে ক্ষেপাতেন।

ঘরভাড়া বাকি পড়ায় নিজাম পুরনো ঘর ছেড়ে দিলেন, বাদামতলীতে আরও কম ভাড়ায় একটা ঘর নিলেন। বাদামতলা সেখান থেকে আরো দক্ষিণে বাঁধাবটতলা-মুদিয়ালীর হিন্দুপাড়া পেরিয়ে, রামদাসহাটি ধরে সন্তোষপুর রেল স্টেশনের দিকে যেতে একটা অস্বাস্থ্যকর নীচু জলা জায়গা। মেটিবুরুজের উর্দুভাষী-মহল্লা থেকে বেশ কিছুটা দূরে জায়গাটা। ওখানে আগে উর্দুভাষীদের বাস মোটেই ছিল না। কিন্তু উর্দুভাষী-মহল্লায় মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাবে লোকে বাদামতলার দিকে আশ্রয় নিতে থাকে ওই সময়। উর্দুভাষী মুসলমান শ্রমিকেরা কেউ কেউ কিছুটা সস্তায় জমিও কিনতে থাকেন ওখানে। আশপাশে মুসলমান বলতে বাঙালি ওস্তাগর আর দর্জিদের বাস বহুকাল আগে থেকেই। আমি নিজামভাইয়ের বাদামতলীর ঘরে যাইনি। তবে শুনেছি ঘরের সামনে ডোবার জলের ওপর দিয়ে হেঁটে ঘরে ঢুকতে হতো। ওঁর মেয়েগুলো তখন খুবই ছোটো। ওরা মা-বাবার কোলে চেপে ঘরে আসত-যেত।

নিজামের অভাব আরো বাড়ল। কিন্তু মনোবল তখনো অটুট। লড়াইয়ের জোরে কাজ ফিরে পাব, সুদিন আসবে, এই ভাবনা নিয়ে ইউনিয়নের সমস্ত কাজে হাজির থাকতেন নিজামুদ্দিন। ইউনিয়ন-লড়াই থেকে কিছুটা এগিয়ে, সব মিলিয়ে একটা জীবনের ছবি আঁকার চেষ্টা করতেন মনে-মনে। ধারদেনা, ইউনিয়নের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য নিয়ে সংসার টাল খেয়ে খেয়ে চলতে থাকল। ঘরের চৌকি, বাসন, টুকিটাকি আসবাব একটার পর একটা বেচে দিতে হল। মোট ছ'বছর ছাঁটাই হয়ে কাটিয়েছেন নিজামুদ্দিনরা। চার বছরের মাথায় আবার ঘর পাল্টে যেখানে এলেন নিজাম, সেটাকে পুরোদস্তুর ঘর বলা চলে না। একটু জোরে ধাক্কা দিলে তার দেওয়ালগুলো পড়ে যাবে। মেঝেটা কাঁচা। এত সাঁতসেঁতে ঘর, ছেলেমেয়েগুলোর ঠাণ্ডা লেগেই থাকত। ঐ অবস্থাতেই পঞ্চম সন্তান একটা ছেলে হলো। বহু প্রতীক্ষা আর সাধ্য-সাধনার ফল পুত্র-সন্তান পেয়ে ওই কষ্টের দিনেও খুবই খুশি হলো ওঁরা। বাচ্চাটার সর্দি কমানোর জন্য একফোঁটা মাখন জোগাড় করে এনে খাইয়ে দিতেন নিজামের বউ।

সেই দুর্দিনেই নিজামের হার্নিয়া অপারেশন করাতে হলো। মেডিকাল কলেজে সেই অপারেশন হলো। আমি নিজামভাইকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে আনতে গেছি। একটাই প্যান্ট ছিল সম্বল, বউ এসে বাড়িতে কাচতে নিয়ে চলে গেছে। মাটিতে একটা চাদর পরে নিজামভাই বসেছিলেন। বেড পাওয়া যায়নি, তাই গাদাগাদি করে মাটিতেই ঠাঁই। হাসপাতালে আর থাকার দরকার নেই, ছুটি হয়ে গেল। অগত্যা সেই চাদর পরেই হাসপাতাল ছেড়ে বেরোতে হলো নিজামকে। বাস রাস্তায় এসে একটা মিনিবাসে উঠব, বাসের হেল্পার ওঁকে উঠতে দিতে চাইছে না। আমি হস্তক্ষেপ করাতে চাদর পরা নিজামুদ্দিনকে বাসে উঠতে দেওয়া হলো।

নিজাম, রামানন্দ, প্রদীপ, ইয়াকুবের মতো শ্রমিকদের সঙ্গে যখন দেখা হতো সমস্ত প্রাণটা জুড়িয়ে যেত। কোথায় চলে যেত খিদে-তেষ্টা, সারাদিনের ক্লান্তি, মাথার ভিতর উকুনের মতো বিজবিজে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি—আমরা দুদণ্ড গল্প করে আরাম পেতাম। শত দুঃখকষ্টেও নিজাম হাসিমুখেই সামনে এসে দাঁড়াতেন। বছর চারেক ছাঁটাই থাকাকালীন, একদিন এক বুদ্ধিজীবী কমরেড উজ্জ্বলকে বলেছিলেন : 'ঔর টিক নহী পা রহা হ্যায়, উজ্জ্বলদা, হম পাকিস্তান চলে যায়েঙ্গে।' উজ্জ্বল হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারেনি। আজকাল মেটিয়াবুরুজে PTV দেখার চল হয়েছে, অন্য বিদেশী চ্যানেলের মধ্য দিয়েও PTV-র প্রোগ্রাম দেখে লোকে। তখন বোধহয় এই রেওয়াজ ছিল না। পাকিস্তান হয়তো মুসলমানদের কাছে ছিল বেশ দূরের এক শান্তি আর স্বস্তির জায়গা। উর্দুভাষী শ্রমিকেরা অনেকেই মাঝে-মধ্যে গাঁয়ের বাড়ি যেতেন। বিশেষত আত্মীয়দের সাদী-গওনা উপলক্ষ্যে। বিহারের বিভিন্ন জেলায় তাঁদের গ্রাম। নিজামেরও সেরকম একটা গ্রাম হয়তো ছিল। কিন্তু সেখানকার সঙ্গে সম্পর্কটা এতই খারাপ হয়ে পড়ে, নিজামকে কখনো 'গাঁও' যেতে দেখিনি।

শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে

দিলেন নিজামুদ্দিন। সেই সঙ্গে একটা চিঠি লিখেছিলেন হিন্দিতে। তাতে বলেছিলেন : 'আমি একজন অশিক্ষিত শ্রমিক, আপনাদের মতো লোকেদের সঙ্গে একসঙ্গে চলার উপযুক্ত নই। আপনারা মার্ক্স-লেনিনের মোটা-মোটা কেতাব পড়ে শিখেছেন জিরো।' রাজনীতি থেকে বেশ কিছু শ্রমিককেই দূরে সরে যেতে দেখেছি। সেটা অনেকটা চুপচাপ কেটে পড়া! কিন্তু এ ধরনের চিঠি লিখে বিদায় নিতে দেখিনি। আমি 'অশিক্ষিত' কথাটা ব্যবহার করলাম, নিজাম লিখেছিলেন : 'জাহিল'।

নিজাম ছিলেন আমার কাছে অন্য জীবনের একটা ঝলক। শ্রমিকশ্রেণী নিয়ে চর্চায় এই ঝলকের কথাই বোধহয় লেনিন লিখেছিলেন তাঁর 'করণীয় কী' (What is to be done) বইতে।

* * *

আমাদের গলির নাম বাবুলের গলি। নামটা আমার বেশ পছন্দ। এই গলিতে দিনভর কত লোক আসে। বিজনদার হোটেলে দু'বেলা খায় কত লোক। ব্যাচেলররা তো আছেই, আবার ক'মাসের জন্য বউ হয়তো দেশে গেছে, কিংবা ঘরে রাঁধতে ভাল লাগছে না, অথবা টানা ডিউটি-ওভারটাইম করতে হচ্ছে, তখন বিজনদাই ভরসা। আর নাস্তার কচুরি, ঘুগনি, তেলেভাজা, মুড়ির খদ্দের তো লেগেই থাকে। বাবুলের গলির অন্য আকর্ষণ সাট্টার স্লিপ লেখানো, কিংবা তেঁতুলতলা পেরিয়ে চোলাই মদ খাওয়া—সাধারণ গরিব লোক তো আছেই, মুদিয়ালী কি সেকেন্ড লেনের বাবুদেরও অফিস ফেরত পদার্পণ হয় এই বাবুলের গলিতে। আর কাছেপিঠের লোক পেচ্ছাপ করতে আসে এ-গলিতে।

পরে জেনেছিলাম বাবুল মানে হলো বাবুল সেন। মারা গেছেন। তিনি এ পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন না কোনোদিন। গলির মুখেই তাঁর ঠেক ছিল, আর বাড়ি মুদিয়ালী স্কুলের সামনে বড়ো রাস্তার ওপর। বাবুল সেন প্রচণ্ড মদ খেতেন। একবার নাকি মদ খেয়ে মোটরবাইক চড়ে নেশার ঘোরে একটা ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে ধাক্কা মারেন। তারপর থেকে তাঁর একটা পা ছিল খোঁড়া। এহেন মদ্যপ, মস্তান প্রকৃতির লোকেরাও নাকি মেয়েদের ইজ্জত দিতেন, সরাসরি রাজনৈতিক দল করতেন না। বাবুল সেনের সমসাময়িক ওই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন মেটেবুরুজের আহির সর্দার।

পোর্টের লাগোয়া এতবড়ো শ্রমিকাঞ্চল, মস্তানদেরও একটা জমকালো বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে এখানে। মস্তানদের এখানকার মানুষ বলেন : ভাইয়া। রাজনৈতিক নেতাদেরও বলেন ভাইয়া। রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে এঁদেরকে লোকে কিছুটা মাথা ঝুঁকিয়ে 'নমস্তে ভাইয়া', 'আসলাম ওয়ালেকুম' বলে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ করে। এটা শুধু ভয়ে নয়, থানা-পুলিশ, ছেলের স্কুলে ভর্তি, সই-সাবুদ, ঘরোয়া-পাড়াগত বিবাদ, দরখাস্ত লেখানো, কোর্ট-কাছারিতে লোকে এঁদের শরণাপন্ন হয়।

একবার বাস্তিকলের গলিতে পার্টি-অফিসে নিজামভাই হার্নিয়ার ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। হঠাৎ ব্যথাটা বেড়ে গেছে। কোথা থেকে যেন সেখানে উদয় হলো কসমা। একটা জ্যাকেট গায়ে চড়ানো এই দুঃসাহসী যুবককে হয়তো অনেকেই চোখে দেখেনি। কিন্তু নামেই তাকে সমীহ করে সকলে। কসমা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল : 'ক্যায়া হুয়া ইনকা?' 'ভাইয়া' বলে এগিয়ে কেউ একজন নিজামের অসুস্থতার কথা জানালো। কসমা কাকে যেন ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে মোড়ের দোকান থেকে এক গ্লাস গরম দুধ চলে এল। তারপর আরও বেশ কিছু লোকজন জমে গেল। সেসব কথাবার্তায় না ঢুকে কসমা দরকারি নির্দেশ দিয়ে চলে গেল।

এভাবেই কসমা পরিচিত ছিল একদিকে এলাকার ত্রাস, আবার গরিব সহায়-সম্বলহীন নিষ্পেষিত শ্রমিক, এমনকী ঘরে-ঘরে মেয়ে-বউদের বিপদের বন্ধু। কসমা এসেছিল শ্রমিকদের মধ্যেও একদম নীচের তলার এক পরিবার থেকে। ছোটবেলা থেকেই দুঃসাহসিক কাজের মধ্য দিয়ে তার বেড়ে-ওঠা। শুনেছি ছোটবেলায় নিজের বস্তির লাগোয়া এলমি কারখানার পিছনের প্রাচীর টপকে চুরি করতে গিয়ে সে পুলিশের হাতে মাঝে-মধ্যে ধরা পড়ত। আর লোকে দেখত কসমাকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পুলিশ মারধর করছে।

আমরা যখন মেটেবুরুজে বারো বছর আগে এলাম, তখন ঘোষবস্তিতে কসমার গ্রুপের ত্রাসের শিকার হয়েছে দুজন। সেই ত্রাসের পরিস্থিতির মধ্যে আবার ওই বাবুলের গলিতেই ঘর পাওয়া গেল। এমনিতে ঘর পাওয়া বেশ মুশকিল, আমরা সুযোগটা ছাড়লাম না।

তার কিছুদিন পর কসমা মারা গেল। ওয়াকি-টকি হাতে নিয়ে নির্দেশ দিতে-দিতে ক্ষিপ্রগতি কসমা আসছে... মহল্লার অলিতে-গলিতে ফিসফিসিয়ে সে-বার্তা ছড়িয়ে গেল, সে ঢুকছে হয়তো বস্তির ঘেঁষাঘেঁষি ঘরগুলোর ছাদ টপকে-টপকে, কিংবা বড়ো রাস্তায় অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে কসমার, গুলির শব্দে চারদিক নিমেষে শুনশান। সেই কসমা চলে গেছে। ওর মৃতদেহের পিছনে কাতারে কাতারে মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে গেল।

* * *

দিনের বেলা এই বাঁধাবটতলার চেহারা কিছুটা অন্যরকম।

লর্ডসনরীচ-মেটেবুরুজের কারখানায়-কারখানায় তখন অন্য সমস্ত এলাকা, এমনকী অন্যান্য জেলা—হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪ পরগনা থেকে লোকে কাজ করতে এসেছে। বাঁধাবটতলাতেও তখন বারুইপুরের মানুষ কাঁঠালী কলা বেচতে এসেছে, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে কেউ রাত থাকতে উঠে মাছ বেচতে এসেছে। দুপুর গড়িয়ে যখন ব্রেসব্রীজ হয়ে ট্রেন ধরবে ওরা, ঘরে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে আসবে। বিশ্রাম, খাওয়াদাওয়া করে আবার ভোরের অপেক্ষা। আর এদিকে মেটেবুরুজের ভিন-মহল্লা থেকে মুসলমান ছেলেরা ভ্যানে করে মরসুমি ফল বেচছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। একটু বেলা হলে ওরা কেউ চলে যাবে কোনো স্কুলের গেটে, কেউ চলে যাবে কোনো কারখানার গেটে। অথবা অলিতে-গলিতে গিয়ে ওরা হাঁকতে থাকবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এখানে প্রতিদিন আসেন কেউ কিছু কাগজ-শিশি-বোতলওয়ালা, ফলওয়ালা, সব্জিওয়ালা, মাছওয়ালা। এছাড়া আসে তালপাটালী, ডায়মন্ডহারবারের মোয়া, পাঁপড়, কাসুন্দী, আরও কত কী। এক-একজন আসছেন একই জিনিস নিয়ে হয়তো গত বিশ-ত্রিশ বছর ধরে। এমনও আছেন—বাপ আসতেন, এখন ছেলে আসছেন। সেই পুরনো বাঁধাবটতলার চেহারা অনেক নাকি পাল্টে গেছে। ওঁদের মুখেই শুনি। তারাতলা রোডের গা থেকে শুরু হয়ে পাহাড়পুর রোড যেখানে বাঁক নিয়ে কাচ্চিসড়কের দিকে ছুটে যাচ্ছে, আগে সেখানে একটা ওপড়ানো বটগাছের চিহ্ন, এইতো সেদিনও ছিল, বছর পাঁচ-সাত আগে। এখন সে-চিহ্ন সাফ হয়ে যাওয়া তেকোণা জায়গাটায় সকালের দিকে খবরের কাগজওয়ালারা বসে যান। আর সারাদিন সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে থাকে প্যাসেঞ্জারের জন্য। বট-চিহ্ন-বাঁকটা পেরিয়েই ডানদিকে ছিল লালার মাঠ, এখন সেখানে পাকা ছাদের নীচে পাঁচিল-ঘেরা বাজার। দশ বছর আগেও ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে শ্রমিকেরা কারখানা-ছুটির পর নাড়া দিতে দিতে এসে জড়ো হতো সেই লালার মাঠে। সেখানে নেতারা বক্তৃতা দিতেন। লালার মাঠ নেই। কারখানার গেটে জমাট শ্রমিকের ভিড়ে গেটসভাও ক্রমশ উধাও হয়ে যাচ্ছে। বয়লার স্যুট অথবা কালিঝুলি মাখা কাজের পোশাক পরা শ্রমিকের মিছিলও আগের মতো আর ততটা দেখা যায় না।

সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম ১৯৮৩ সালে প্রথম গান্ধী ময়দানে এসে। কেশোরাম কটন মিলে তখন লকআউট। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বক্তৃতা দিতে এসেছেন। বেহালা থেকে আমি আর প্রশান্তদা সাইকেলে চেপে মিটিং শুনতে গেছি। সভায় শ্রোতা প্রায় সকলেই সুতাকল শ্রমিক। সভা শেষ হলো 'লালঝাণ্ডা কী জয়' নাড়া দিয়ে। তার আগে অভ্যস্ত ছিলাম 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে। 'লালঝাণ্ডা কী জয়' শুনে কেমন যেন 'দুগ্‌গা মাঈ কী জয়' আওয়াজটা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমার অবশ্য তখন প্রত্যেক পলকে বিস্ময়—কেশোরাম মিল, শ্রমিকদের লাইনবাড়ি, লালবাড়ি (ইউনিয়ন অফিস), হাফ-হাতা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা শ্রমিকনেতা অরুণ সেন, এক-একজন ওড়িয়া-বাঙালি, মাদ্রাজি শ্রমিক... যেন 'পথের পাঁচালী'র অপুর গাঁয়ের সীমানায় ছুটে গিয়ে রেলগাড়ি দেখার মতো। তবে আজও যখন মেটেবুরুজ থানা পার হয়ে কেশোরাম মিলের সামনে দিয়ে রাজাবাগানের দিকে যাই, মনে কেমন যেন হারিয়ে যাওয়া কিছু অনুভব ফিরে আসে। কমিউনিস্ট পার্টি গলে গেছে, পচে গেছে, এমন সব তিক্ত উপলব্ধি ছাপিয়ে শ্রমিক জীবনের অনেক স্মৃতির টান কী যেন এক কৃতজ্ঞতায় আমাকে আবছা-আঁধার আকুল করে দেয়। মুমূর্ষু অঞ্চলটার প্রায় সাড়াটা বস্তি, চায়ের দোকান, মিল-লাইনে উঁকি মারতে মারতে রাস্তাটা পার হয়ে যাই।

ভয় হয়, কবে দেখব লালার মাঠের মতো এই ঐতিহ্য-বিজড়িত গান্ধী ময়দানটাও কোন আকাশের নীলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বাঁধাবটতলার আর একটা দিক-চিহ্ন ফতেপুর হরিসভা। মেটেবুরুজে অনেকগুলো পুরনো হরিসভা আছে। ফতেপুর হরিসভা, মুদিয়ালী হরিসভা, বটতলা-আক্রা ফটকের মাঝে কানখুলি হরিসভা। আর রয়েছে ডজন খানেক, কি তারও বেশি, পঞ্চানন মন্দির। আমাদের বাবুলের গলিতেও তেঁতুলতলায় একটা পঞ্চানন মন্দির রয়েছে। পঞ্চানন মন্দিরে বেশি ভিড় মেয়েদের। হরিসভা কিন্তু মেয়ে-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সকলের মিলন-ক্ষেত্র।

আমাদের পাড়ায় প্রায় নব্বই-পচানব্বই শতাংশ কর্মক্ষম মানুষই শ্রমিক। বাড়ির মেয়েরা গায়ে-গতরে শ্রম-এর অর্থে অনেক বেশি শ্রমিক। সংসারটাকে ম্যানেজ করে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার বুদ্ধির শ্রমটাও তাঁদেরই। ভোর থেকে রাত অবধি কাজের মধ্যে রয়েছেন। কোনো বাড়ির মেয়ে-বউ ঠোঙা বানান, জামা-প্যান্ট সেলাই করেন ফুরনে, লোকের বাড়িতে ঝি বা আয়ার কাজ করেন, চায়ের গোডাউন বা অন্যত্র প্যাকেজিং-এর কাজ করেন, ছোটো বাচ্চাদের টিউশনি করেন, আর ঘরের বারো আনা কাজের খাটুনি তো সকলের জন্যই বাঁধা। কোনো কোনো সংসারে মহাদেবের মতো নির্লিপ্ত স্বামীকে নিয়ে সেটা চোদ্দ-পনের আনাতেও দাঁড়ায়—বাজার করা, কেরোসিন-রেশন তোলাও বউয়ের দায়িত্ব।

মেয়েদের এতসব প্রাত্যাহিকীর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ব্রত-মানত-পুজো। পঞ্চানন মন্দির তাই এই জীবনেরই কেন্দ্র। কোনো কোনো ঘরে টিভি আসার পরও মেয়েদের সামান্য ফুরসত কাটানোর জায়গা পঞ্চানন মন্দিরের দালানটা। মন্দিরে আয় আগের থেকে বেড়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু খরচ নিশ্চয় তার থেকেও বেশি বেড়েছে। তাই পুরুত ঠাকুরদের এখনকার প্রজন্ম কেবল পুজোর ... য়ে নির্ভর করে চলতে পারছে না। সপ্তাহের যে দিনগুলোতে পুজোর কাজ কম, সেদিন ওবাড়ির কোনো ছেলে ভ্যান-রিকশা টানছে, আর এক ছেলে হালে মন্দিরের লাগোয়া ছোট্ট মুদির দোকান খুলেছে।

ফতেপুর হরিসভায় পুজো করেন ভাস্করদা, আমার স্বল্প পরিচিত। সাদা দাড়িওয়ালা মিষ্টি স্বভাবের ভাস্করদা হরিসভার সকলের কাছে প্রিয়। ওঁর ছেলে হরিমোহন ঘোষ কলেজে পড়ে, আবার বাবার পাশাপাশি পুজোর কাজও সারে। ওঁদের ব্যস্ততা দেখে বোঝা যায়, ওঁরাও বাস্তবত শ্রমিক। সাইকেল নিয়ে সকাল থেকে ওঁদের দৌড়ঝাঁপ চলতে থাকে।

এক সাহিত্য-সভায় গিয়ে ভাস্করদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। উনি নিজে সাহিত্য রসিক বামপন্থী মানুষ, তবে এখন আর চর্চার ফুরসত পান না। একসময় নাকি খুবই ভাল বাঁশি বাজাতেন। সেই ভাস্করদা যখন সন্ধেবেলায় ধুতি-উত্তরীয় গায়ে হরিসভায় ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করেন, সে এক অন্য মানুষ। তখন তাঁকে ঘিরে একটা ভিড় জমাট বেঁধে উঠছে। সে-ভিড় কেবল মেয়েদের নয়। বরং তখন সেখানে মধ্যবয়স্ক সংসারী শ্রমিক, এমনকী যুবকও দুই হাত জড়ো করে ভগবানের প্রার্থনায় মগ্ন। আর কাঁসরঘণ্টার আওয়াজটা তরঙ্গের মতো ঢেউ তুলতে তুলতে ছড়িয়ে পড়ছে হরিসভার তেমাথা পেরিয়ে বাঁধাবটতলা, রামদাসহাটি, ফতেপুর সেকেন্ড লেনের দিকে।

হরিসভার উল্টো ফুটে উঁচু বারান্দার ওপর বাঁকার চায়ের দোকানে তখন আড্ডা জম্‌ব জম্‌ব করছে। রামদাসহাটি-শিবনগর যাওয়ার রাস্তার বাঁকের ওপর এই চায়ের দোকানে বছর কয়েক আগেও দেখতাম সংসারী মাঝবয়সী, এমনকী প্রবীণ মানুষও এক কাপ চা খেয়ে ঘরে ফিরতেন। বাঁকার চায়ের স্বাদটা ভাল, বেশ যত্ন নিয়ে লিকার তৈরি করা চা, ফোটানো নয়। সন্ধের ভিড়ে বাঁধাবটতলায় একটু বসে আড্ডা মারার মতো সামান্য জায়গাও রয়েছে দোকানটায়। ফলে আড্ডাবাজরা জমা হতো। একসময় মূলধারার বাইরের বামপন্থীদের, যেমন অনন্ত সিংহ গোষ্ঠী, নকশাল ইত্যাদিদের আড্ডা ছিল ওখানে। এখন সেসব গল্প আড্ডা না মেরে দু-দণ্ড চুপচাপ বসে এক কাপ চা খেয়ে চলে যেতে চাইত যারা, তাদেরও এখানে ঠাঁই ছিল। সব মিলিয়ে জমজমাট ছিল বাঁকার চায়ের দোকান, ইদানীং সেই জমজমাট ভাবটা অনেকসময় চোখে পড়ে না।

জমজমাট চেহারাটা বাড়তে দেখছি সতীশ ময়রার মিষ্টির দোকানে। হরিসভার লাগোয়া প্রায় বিশ-ত্রিশ ফুট চওড়া সতীশ চন্দ্র মোদকের দোকান। একদিকে আলাদা মুড়ি মুড়কি, চি... গুড় বাতাসার বন্দোবস্ত, অন্যদিকে মিষ্টি। দোকানটার অঙ্গ এখনও কলকাতার পুরনো মিষ্টির দোকানের মতো—যেমন কালিঘাটের বিখ্যাত হারাণ মাঝির মিষ্টির দোকান। তবে সতীশ ময়রার বাড়ির ছেলে হলদীরাম মার্কা আধুনিক মিষ্টির দোকান খুলেছে বাঁধাবটতলা মোড় ছাড়িয়েই। সেখানে তেমন ভিড় নেই। সতীশ ময়রার দোকানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খদ্দের। কখনো কখনো বেশ ভিড় লেগে যায়। খুচরো দু-পাঁচ-দশ টাকার খদ্দের যেমন অফুরন্ত, তেমনই রয়েছে বড়ো বড়ো অর্ডারী খদ্দের। সাবেকি মিষ্টির রকমগুলোও অনেকটা রয়ে গেছে। সতীশ ময়রার দোকানে খদ্দেরদের ভিড়ে বাঁধ ভেঙে পড়ে পুজোর দিনগুলোতে। এইসব এক-একটা জমায়েত থেকে মেটেবুরুজের জনসংখ্যারও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

• • •

জমজমাট বাঁধাবটতলা মোড়ে কোনো সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা মিলত ইয়াকুব মিঞার সঙ্গে। মহম্মদ ইয়াকুব ছিলেন পোদ্দার সুতাকলের একটি ইউনিয়নের সম্পাদক। নামেই সম্পাদক, কাজে আর বিশেষ পাওয়া যেত না। উনি ছিলেন বহুদিনের সুতাকল শ্রমিক। বেশ কয়েকটা সুতাকল ঘুরে তবে এখানে এসেছিলেন। পোদ্দার প্রজেক্ট নতুন মিল, ১৯৭৮ সালে জন্ম। অতীতে ইউনিয়ন করার সূত্রে সুতাকল শ্রমিকনেতা অরুণ সেনের সঙ্গে কাজ করেছেন ইয়াকুব ভাই। সেই থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ। শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পোড়-খাওয়া নেতাদের গোলমালগুলো খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। কোন মিলে কোন সময় কোন নেতা কত হ্যাঙ্ক প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিয়ে কোম্পানির প্যারে দোস্ত বনেছিলেন, সেসব গল্প ওঁর মুখে শুনেছি।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। কারণ ইয়াকুব মিঞা আশির দশকে একটু একটু করে মৌলভী সাহেব হয়ে যাচ্ছেন। সাদা টুপি সাদা দাড়ি নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, লোককে তাবিজ-টোটকা দেন। আর মিলে চাকরি করার সুবাদে নাচার হয়ে ইউনিয়ন করেন। মিল ছুটির পর ওঁকে পাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। যদি বা পাওয়া যেত, ওই মগরিব-এর নামাজের পর খানিক সময়ের জন্য বাঁধাবটতলা মোড়ে। তা-ও সঙ্গে কেউ

না কেউ রয়েছে দেখা যেত। আসলে ইয়াকুব ভাই মোটেই সংসারী ছিলেন না, কিন্তু ঘোর সামাজিক মানুষ। সেই সামাজিক ক্ষেত্রটা ট্রেড-ইউনিয়ন পার্টি থেকে ক্রমশ মজ্‌হব-এর দিকে সরে যেতে থাকল ইয়াকুবের জীবনে। ইউনিয়নের মিটিং-এ বা মিলের ভিতর কোনো সমস্যায় ইয়াকুবকে পেলে রামপ্রকাশ প্রদীপ-গামার মতো চেলারা বুকে বল পেত। ইয়াকুবের অতীত অভিজ্ঞতার গল্পগুলো ওরা মন দিয়ে শুনত।

মিলে দু-চার বছর অন্তর লকআউট হতোই। লকআউট হলে দশ আনা শ্রমিক গ্রামে চলে যেত—মানে উত্তরপ্রদেশ বিহার উড়িষ্যায়। বাকি ছ'আনার প্রায় সকলেই যে-যার ধান্দায় জুটে যেত। মিলের মাইনে ছিল এমনিতেই অল্প। ফলে দু-চার-ছ'মাসের খোরাকি কারুরই প্রায় জমা থাকত না। মিলের চত্বরটা শুনশান হয়ে যেত। একবার লকআউট হব-হব করতে পরের রুটিনটা সকলের মুখস্থ হয়ে গেছে। এবার ঠিক হলো, ইউনিয়ন নেতাদের গেটে থাকতে হবে, দেশে চলে গেলে চলবে না। কীভাবে যেন বেশ ক'মাস ইয়াকুব থেকে গেলেন। রোজ সকালের দিকে আমরা মিলের গেটে জড়ো হতাম।

মিলের আশপাশে আর বেহালা-আমতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শ'চারেক শ্রমিক ছিল। যারা গেটে মাঝেমধ্যে এসে পড়ত, তারা আমাদের কর্মসূচি নেওয়ার জন্য চাপ দিত। কিন্তু কোনো কর্মসূচিতেই পঞ্চাশ-একশজনের বেশি শ্রমিককে পাওয়া যেত না। চার-চারটে ইউনিয়ন, সকলে একত্রে মাঠে নামলেও সেই একই চেহারা। মিলের পরিস্থিতিটা পাল্টানোর মতো আত্মবিশ্বাস শ্রমিকদের ছিল না। শ্রমিকদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে জি এম বাঙানী সাহেবকে কেমন যেন সমীহ করত। তার মধ্যে ভয় ভক্তি বিশ্বাস সবই যেন কেমন মিলেমিশে ছিল। শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হলে যত না বাঙানীকে গাল দিত, তার থেকে বেশি গাল দিত ইউনিয়ন নেতাদের আর লেবার অফিসারকে।

সেবার লকআউট হওয়ার পরপরই ইউনিয়ন থেকে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে একটা লিফলেট দেবার কথা হলো। লিফলেট সাধারণত আমরা বাইরের লোকেরাই লিখতাম, সেটাই চালু রেওয়াজ ছিল। আমি ইউনিয়ন সম্পাদক ইয়াকুবকেই লিফলেটটা লিখতে বললাম। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ইয়াকুবকে রাজি করানো হলো। ঠিক হলো উনি হিন্দিতেই লিখবেন। তিনি হিন্দি উর্দু দুটো ভাষায় লিখতে জানতেন।

দু-তিন দিন পর ইয়াকুব ভাই যেটা লিখে নিয়ে এলেন, সেটা লিফলেট নয়, একটা গান। মিল-শ্রমিকের জীবনের গান। তার সুরটা ছিল কান্না ভেজা একঘেয়ে, আর শেষে সেই কথাটাও ছিল যে এই জীবন-কাহিনি শুনে সকলের চোখে জল চলে আসে...

সেবছরই ঐ লকআউটের মধ্যে পুকুরে শাক তুলতে গিয়ে খোলা ইলেকট্রিক তারে শক্ খেয়ে মারা গিয়েছিলেন মিল-শ্রমিক দেবেন মণ্ডল। মারা যাবার খবর পেয়ে আমি, প্রদীপ, ইয়াকুব ভাই আর শঙ্কর মজুমদার দেবেন মণ্ডলের বাড়ি গেলাম। রামদাসহাটি পেরিয়ে পদীরহাটিতে একটা নিজস্ব কুঁড়েঘর দেবেন মণ্ডলের। যাওয়ার সময় রাস্তাতেই তুমুল বৃষ্টি নামল। আমরা ভিজতে ভিজতে যখন ওঁদের মাটির ঘরের দাওয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম, ওঁরা সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। দেবেন মণ্ডলের স্ত্রী সামনে এগিয়ে এলেন, ছেলেমেয়েগুলো এদিক-ওদিক থেকে অবাক হয়ে আমাদের দেখতে থাকল। আমরা বললাম : 'আমরা ইউনিয়ন থেকে এসেছি।' তাতে মহিলার ভাবলেশ কিছু পাল্টাল না। অগত্যা আমার প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মতো সান্ত্বনা আর সাহায্যের কথাগুলি বলে ফেললাম। ওঁরা আমাদের কী যে বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমরা বিদায় নিলাম।

সেই দেবেন মণ্ডলের বউ ছ'মাস আগে পর্যন্ত আমাদের এই বাবুলের গলির মুখে রাস্তার ও-ফুটে সকালে জিনিস বেচতে আসতেন। অন্য লোকের বাগান থেকে নারকেল কলমী-কচুর শাক আর দেশি হাঁস-মুরগির ডিম নিয়ে বউদি এখানে এসে বসতেন। দেবেন মণ্ডল যখন মারা গেলেন তখনো তিনটে ছেলে আর আধ-পাগল এক মেয়ে খুবই ছোটো। বড়ো মেয়ে আর বড়ো দুটো ছেলে বুঝতে শিখেছে। সেই বাচ্চাগুলোকে বউদি বড়ো করে তুললেন, আধ-পাগল ছোটো মেয়ের বিয়ে দিলেন। মেজ ছেলেটা জন্ডিসে ভুগে মারা গেল, তার বউ আর বাচ্চার দায়িত্বও বউদিকে ঘাড়ের ওপর নিতে হলো। এসব দায় সামলাতে সামলাতে বউদি গত দশ বছরে আমাদের চোখের সামনে পুরনো জটপাকানো নারকেল দড়ির মতো শুকিয়ে গেলেন। এখন অসুখে নাজেহাল, ঘর থেকে উঠে বাঁধাবটতলা আসার সামর্থ্যও আর নেই।

ইয়াকুব ভাই কোনোদিন গেটে না এলে আমি ওঁর রামদাসহাটির ঘরে হানা দিতাম। সত্যিই অসম্ভব দারিদ্র্যের ছাপ ছিল সেই কুটিরের সর্বত্র। সামনে তার একটা বড়ো পচা ডোবা। ঘরে আসবাব প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। ইয়াকুব ভাই একটা তেল চিটচিটে ময়লা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে একটা ছোটো চৌকির উপর শুয়ে থাকতেন। বাইরে যখন বেরোতেন একটা মোটামুটি পরিষ্কার সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে

বেরোতেন। থান কিনে সেগুলো নিজেই কেটে সেলাই করে নিতেন। নানারকম হাতের কাজ জানতেন।

লক আউটের সুযোগে ইয়াকুব ভাইকে মাঝে-মধ্যে পেয়ে যেতাম। একদিন লিট্টি খাওয়ার কথা উঠল। দেওঘর স্টেশনে রাতে লিট্টি বিক্রি হতে দেখেছি। সস্তায় সার্থক পেট ভরার খাবার আর সঙ্গে টিনের থেকে জল ঢেলে দেওয়া হলো। সেই গল্প শুনে গামা আর শঙ্কর মজুমদার আমাদের বাড়িতে লিট্টি তৈরি করলেন। সত্যিই বেশ চমৎকার খেতে। ইয়াকুব ভাইও ছিলেন লিট্টির ফিস্টে। এই যাতায়াতকে কেন্দ্র করে, ইয়াকুব ভাইয়ের কাছেই আমার উর্দু শেখা শুরু হলো।

ইয়াকুবের ভাই আকবর। তিনিও খুব বুদ্ধিমান এবং সামাজিক মানুষ। বেশ লম্বা কালো ছিপছিপে চেহারা, গালে চাপদাড়ি, আর তাঁর উপস্থিতিটাই কেমন যেন শান্ত, চিন্তাশীল। পোদ্দারে চাকরি করতেন। ইউনিয়নে থাকলে খুবই কাজের লোক হতে পারতেন। কিন্তু তাকে পাওয়া ছিল দুষ্কর, মাসের অর্ধেকদিন ডিউটিতে নাগা করতেন। থাকতেন মেটেবুরুজের শেষপ্রান্তে আক্রা ফটকের গঙ্গার ধারে একটা ছোট্ট বস্তিতে।

দুই ভাই-ই বিচক্ষণ, জনপ্রিয় অথচ গরিব। জনপ্রিয় বলতে সাধারণ, অতি-সাধারণ শ্রমিকদের বুদ্ধি-পরামর্শ দেবার লোক, মাঞ্জা-দেওয়া নেতা-টেতা নন। ইয়াকুব ভাই তো দিনদিন ধারদেনায় ডুবতে ডুবতে বেসামাল হয়ে পড়লেন। লকআউট ওঠার আগেই এখানকার পাট গুটিয়ে নেবার কথা ভাবতে লাগলেন।

তারপর মিল চালু হল। একসময় ইয়াকুব ভাই মিলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সামান্য টাকাপয়সা সম্বল করে নিঃশব্দে দেশে চলে গেলেন। গোরখপুরের বেলা গ্রামে ওর সঙ্গে গেল একটা আটাচাকি—উপার্জনের শেষ সম্বল। অন্য কেউ কেউ মিলের স্থায়ী চাকরি ছেড়ে দিয়েও পরে আবার কম মজুরিতে অস্থায়ী শ্রমিকের কাজে ফিরে এসেছে মিলে। ইয়াকুব মিঞাকে আর দেখা যায়নি।

* * *

তাতাই বলছিল : 'মনে থাকবে, মনে থাকবে' কাকলি বলল : 'কতদিন'? তাতাই আমার ছেলে, ঘরের বাইরে তিনতলার সিঁড়ি থেকে কথা বলছিল। কাকলি ছিল ওদের তিনতলার ছাদে। কাকলি আমাদের বাড়িওয়ালার বড়ো মেয়ে, এবাড়িতে তাতাইয়ের দিদি। ওরা প্রায়শই বেশ জোরে জোরে অথচ স্বচ্ছন্দে গল্প করে। ওদের অবসরের গল্প, কখনো কখনো কানে দু-এক টুকরো চলে আসে। মনে থাকবে তাতাইয়ের, কিন্তু কতদিন? এ-বড়ো কষ্টের প্রশ্ন, কঠিন জবাব। জীবনভর মনে কি থাকে রোজকার টুকরো-টুকরো সুখ-দুখ, ভালোবাসার কথা। আমি ওদের হালকা কথাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে চলে এলাম। আসলে তাতাই কাকলির কাছে জামাইষষ্ঠীর দিন বাড়িওয়ালার ঘরে ভালমন্দ খাওয়াদাওয়ার খবর নিচ্ছিল; সবে ক'মাস আগেই কাকলির ছোটবোন সোনালির বিয়ে হয়েছে। প্রথম জামাইষষ্ঠী, নতুন জামাই এসেছে, একটু ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া তো হবেই। তাতাই কাকলিকে ক্ষেপাচ্ছিল : 'দিদি খাওয়ালে না, মনে থাকবে...!' কাকলির ছোট্ট জবাবটাই বিষয়টাকে অন্য কোথায় যেন নিয়ে এল— সত্যি কতদিন মনে থাকবে?

আমরা যখন বারো বছর আগে এ-বাড়িতে এলাম, তখন কাকলিকে আমি একদমই চিনতাম না। আসার পরপরই দেখলাম বাড়িওয়ালা অজিত ঘোষের বৃদ্ধা মা অসুখে ভুগতে ভুগতে মারা গেলেন। সেই মাকেও তেমন চোখে দেখিনি; শুধু তাঁর মৃত্যুর আগেকার যন্ত্রণার কিছু ক্ষীণ আওয়াজ পেতাম। আর শুনতাম, বৃদ্ধার চিকিৎসাও নাকি তেমন হচ্ছে না। কিন্তু সেই মা মারা যাবার পর ভাড়াটেরা সবাই দুদিন পাতপেড়ে নেমন্তন্ন খেয়েছিলাম।

তখনো কাকলিকে তেমন নজরে পড়েনি। অনেক পরে চোখে পড়েছিল। ছাতা মাথায় গলি দিয়ে দ্রুতপদে ওকে যেতে-আসতে দেখতাম। কিন্তু ও-যে বাড়িওয়ালার বড়ো মেয়ে সেটা জানতে আমার বেশ ক'বছর লেগে গিয়েছিল।

আসলে আমার মগজে বাড়িওয়ালা নামক অস্তিত্বের প্রায় চোদ্দ আনা জুড়ে ছিল তখন বাড়িওয়ালার ডাকাবুকো বউ। বাড়িওয়ালা অজিত ঘোষ ছিলেন জি ই সি কারখানার শ্রমিক, পরে রিটায়ার করলেন। অজিত ঘোষ মিনমিনে স্বভাবের, রাস্তায় নিঃশব্দে একপাশ দিয়ে গুটিসুটি মেরে হেঁটে চলে যেতেন, আজও যান। জি ই সি-তে ওঁকে নাকি সকলে পাগলা বলত। যতই চুপচাপ স্বভাবের হোন না কেন, অজিতদাকে পাখিপড়া করে বউ যা শিখিয়ে দিতেন, সেটা তিনি ভালই অনুসরণ করতে পারতেন।

বাড়িওয়ালা হিসেবে ওঁদের একটা পলিসি ছিল বরাবরই : দেখেশুনে ভাড়াটে বসানো এবং খুব বেশিদিন না টিকতে দিয়ে তাদের ওঠানোর ব্যবস্থা করা। এ-বাড়ির সবচেয়ে পুরনো ভাড়াটে সুকান্তরা, আর তার পরেই আমরা। আমাদের চোখের সামনে এ-বাড়ি থেকে একের পর এক বিদেয় নিয়েছেন : হিন্দুস্তান লিভারের শ্রমিক-পরিবার, গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্সের শ্রমিক-পরিবার, ব্রেথওয়েটের শ্রমিক-পরিবার। তাদের প্রত্যেকের এক-একটা আলাদা গল্প, এক-একরকম।

বাড়িওয়ালারা পাড়ায় সাতে-পাঁচে মোটেই থাকত না কখনো। আমরা ইউনিয়ন করি, রাজনীতি করি, বাড়িতে

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোকেদের যাতায়াত লেগেই থাকত। অজিতদার বউয়ের এটা খুবই অপছন্দের। অজিতদার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে : 'আমরাও তো অফিসে ইউনিয়ন করি, বাড়িতে দিনরাত এত লোক আসবে কেন?' ওটা ছিল ওয়ার্নিং। তারপর একদিন সন্ধের দিকে, তখন আটটা বাজে, ঘর থেকে হঠাৎ অজিতদার স্ত্রীর গলা পেলাম : 'এত রাতে উপরে উঠবেন না, নেমে যান...।' সিঁড়ির কাছে এসে আলো জ্বালিয়ে দেখি প্রসাদ আর জীতেন্দর হতভম্ব হয়ে সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদিকে বাড়িউলি গলা চড়িয়ে খারাপ কথা বলে চলেছেন। আমাকেও কিছুটা গলা চড়িয়েই দু-এক কথার জবাব দিতে হলো। প্রসাদ আর জীতেন্দরকে আমি ঘরে ডেকে নিয়ে এলাম। তখনো সিঁড়িতে শুনতে পাচ্ছি : 'এটা কি কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি? সকাল থেকে যত রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, লুঙ্গিওয়ালা যখন-তখন আসতে থাকবে...।'

আমাদের ঘরে হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকদের অবাধ যাতায়াত ছিল। তার মধ্যে লুঙ্গি-পরা মুসলমান শ্রমিকও থাকত। বাড়িউলি অন্য ভাড়াটেদের নিয়ে কিছুটা দল পাকাবার চেষ্টাও করলেন। বিশেষ করে আমাদের নীচে দোতলার ভাড়াটেদের, কেননা ওদের দরজার সামনে দিয়ে সকলকে উপরে উঠে আসতে হতো। দোতলায় প্রথমদিকে সনৎদা থাকতেন, তাঁর বড়ো-সড়ো মেয়ে ছিল। আমাদের ঘরে যারা আসত, তাদের অন্য এদিকে-ওদিকে উঁকি মারার অভ্যেস বা অবসর ছিল না। অতএব সনৎদারা বাড়িউলিকে সাথ দিলেন না। পরের দফায় দোতলার ভাড়াটে রিয়া-প্রিয়ার বাবাও বাড়িওয়ালার পাশে দাঁড়ায়নি। এদিক দিয়ে সুবিধা করা গেল না। পরে সনৎদার পিছনে যখন বাড়িওয়ালারা লেগেছিল, ওঁদের জল একদিন বন্ধ করে দিল। সনৎদার মেয়ে টিঙ্কু তখন স্কুলে বেরোবে। ওকে আমরা এক বালতি স্নানের জল পাঠালাম। ব্যস, আমাদের জলও বন্ধ হয়ে গেল।...

এরকম সব লড়াইয়ে নাজেহাল হয়ে একে একে ভাড়াটেরা ঘর ছেড়েছে। ভাড়াটে শ্রমিকেরা হার মেনেছে বাড়িওয়ালা শ্রমিকের কাছে। আমরা তো তারও বাড়া, শ্রমিকদের থেকেও এককাঠি বেশি আগুয়ান, অন্তত গোঁয়ার্তুমিতে। তাই বারো বছর টিকে গেলাম।

কথাটা শুরু হয়েছিল কাকলিকে নিয়ে। গত বছর দুয়েক ধরে সোনালি আর কাকলির বিয়ের চেষ্টা চলছে। অজিতদা জি ই সি থেকে রিটায়ার করেছেন। বড়ো ছেলে মানিক মেটেবুরুজে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে দোকান করেছে, চাকরি-বাকরি হয়নি। ছোটছেলে বাবুলাল লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে। সোনালির একটা পাত্র পাওয়া গেল, পাত্রপক্ষ নাকি তাড়াতাড়ি বিয়েটা সারতে চায়। কাকলির সম্মতিতে ছোটবোনের বিয়েটা আগে সেরে ফেলা হলো। কাকলি বিয়ের ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে করল। এতদিনে আমি ওকে চিনতে পেরেছি। মেয়েটা বেশ কাজের আর ওদের বাড়ির মধ্যে কিছুটা দরাজ মনের।

অজিতদা তো পাড়ায় কখনোই সাতে-পাঁচে থাকেন না। মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-হাতাহাতি, কোনো দুর্ঘটনা, পাড়ায় সাড়া চোলাইয়ের ঠেক-ভাঙা নিয়ে পঞ্চায়েত, পাশের বাড়িতে আকস্মিক মৃত্যু, পুজো-পার্বণ— কোনো কিছু অজিতদাকে বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে গলির ওপর টেনে আনতে পারেনি। অথচ সেই অজিত ঘোষ ১৯৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর রাত্রে ঘর ছেড়ে পাড়ায় পাহারা দিয়েছিলেন আমাদের অনেকের সঙ্গে। মাঝরাতে সামনের বাড়ির দাওয়ায় আমি অজিতদা মুখোমুখি বসে রয়েছি। দৃশ্যটা মনে আছে। বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনার সঙ্গে এই টুকরোটাও বোধহয় মনে থাকবে বহুদিন।

* * *

আজ প্রায় একমাস হয়ে গেল ওপাড়া ছেড়ে আমরা চলে এসেছি। সময়টা কিরকম বিশ্রীভাবে দৌড়য়। রাত এখন সাড়ে নটা। আমি বাড়ি ফেরার পথে রামনগর মোড়ে। ঝুপড়ি-দোকানপাট-গুমটি সব বন্ধ। একটু পরেই সাবান কলের রাতের শিফটে একদল লোক ঢুকবে। আর একদল বেরিয়ে যাবে ইভনিং শিফট সেরে। শেষ 1A অপেক্ষা করছে। আমাকে ২৪১ নম্বর ধরতে হবে। এইতো সেদিন পর্যন্ত বাঁধাবটতলার বাস ধরতাম, আজ আর ওদিকে যাওয়া চলে না।

বাঁধাবটতলা এখনো রামনগরের মতো নিঃঝুম নয়। দোকানপাট খোলা। ছেলে-মেয়ে, ঘরের বউ-বুড়ো-বুড়িরা হয়তো এখন গলির ওপর উঠোনগুলোতে বসে গল্প-গুজব করছে, একটু পরে ওরা শুতে যাবে। আর আমাদের তিনতলার পুরোটাই এখন অন্ধকার। আমরা ছাড়া আর তো কেউ ও-বাড়িতে তিনতলায় থাকতো না।

অজিত ঘোষের বাড়ির তিনতলায় উঠলেই এখন কী আরাম, কত হাওয়া। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে জানলায় চোখ মেললেই পিছনে পানাভরা জলা আর ক'টা কাহিল খেজুর গাছের মাঝে বাঁদিক ঘেঁষে একটা মুণ্ডু কাটা নারকেল গাছ ঢ্যাঙ ঢ্যাঙ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর পিছনে বিশাল জলাভূমি থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসছে মিঠে হাওয়া। আট-বাই-আট ঘরের তক্তাপোশটার ওপর পা-মেলে বসলে প্রাণ জুড়িয়ে যেত।

সেই জলার সামনের দিকটা বুজিয়ে একটু একটু করে গজিয়ে উঠেছে ঘর আর রাবিশ ফেলা পথ। জলাশয় আর বাড়িঘরদোরের সারির পিছনে দেখা যেত তারাতলা রোড, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডের কারখানার মাথাগুলো। তারপর নীলচে-কালো আকাশের গায়ে গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্সের ফিটিং আউট জেটিতে জাহাজের মাস্তুল আর তার থেকেও উঁচু ক্রেনের মাথা। রাতের বেলায় কোথায় যেন একটা চার্জিং হয়ে কোনো চিমনি থেকে শোঁ শোঁ আওয়াজ করে বেরিয়ে আসত বেশ কিছুটা পোড়া-কালো ধোঁয়ার আস্তরণ। আর ছড়িয়ে পড়তো আকাশের গায়ে।

এসবই এখন স্মৃতির পর্দায় দেখি। তবে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই। আর ভাবি আনমনা হয়ে ভুল করে ও বাড়িতে এই রাতের বেলায় পৌঁছলে কেমন হতো। তখনই বুড়ো শ্রমিকের মতো দুপাশে টাল খেতে খেতে ২৪১ নম্বর বাসটা দূর থেকে একটু একটু করে এগিয়ে আসে। রামনগরে বাস থেকে দু-একজন নামে। আমি উঠে পড়ে পিছনের জেন্টস সিটের সামনে দাঁড়াই।

বাসের ভিতর চারপাশটা দেখতে থাকি। কাজ ফেরত পরিশ্রান্ত মানুষ সব। তাদেরই মাঝে দেখি সাহাবুদ্দিন সামনের দিকের সিটে বসে আছে। দূর থেকেই বাসের ডিমে আলোয় চিনতে পারি অবসন্ন সাহাবুদ্দিনকে। বছর দশেক পরে ওঁকে দেখছি। বুড়ো হয়ে গেছে সাহাবুদ্দিন। গালগুলো চোয়ালের ভিতর বসে গেছে। মাথায় নামাজি টুপি, হাতে ওঁর উর্দু খবরের কাগজ। সাহাবুদ্দিনও তাহলে কত পাল্টে গেছে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি : 'কোথা থেকে আসছেন?' হড়মুড় করে ওঁর মুখ থেকে অনেকটা জানা হয়ে গেল। জাকারিয়া স্ট্রীটের চপ্পলের দোকানে ওঁর রোজকার ডিউটি। সত্তর টাকা রোজ। সকাল আটটায় ঘর থেকে বেরোন, রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি সেরে ধর্মতলা থেকে বাসে চেপে ঘরে ফিরতে দশটা বেজে যায়। সপ্তাহে সাতদিনই ডিউটি, ছুটি নেই। সাবানকলে ছাঁটাই কাজ ফিরে পেয়ে সাহাবুদ্দিন আর বেশিদিন চাকরি করেননি। ১৯৯৪ সালে মেয়ের বিয়ে দেবার আগেই ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেন। ভলান্টারির টাকাটা মেয়ের বিয়েতে কাজে লাগে। তারপর আবার হাতখালি। এক ছেলেকে পড়া ছাড়িয়ে সেলাইয়ের কাজে দিয়েছেন, আরেকজন এক আত্মীয়ের দোকানে।

সাহাবুদ্দিন সাবানকলে ঢুকেছিলেন। লোডিং-আনলোডিং-এর ঠিকা শ্রমিক। সাবানের পেটি মাথায় করে ট্রাকে লোড করতে করতে ইউনিয়নের একচেটিয়া সদস্য হয়েছিলেন। তারপর ইউনিয়ন লড়াইয়ের ফসল হিসেবে পার্মানেন্ট হলো চাকরি। এখন সেই চাকরি খুইয়ে তিনি জাকারিয়া স্ট্রীটের চপ্পলের দোকানের কর্মচারী। ওঁর স্বাস্থ্যটা বেশ ভেঙে পড়েছে। হারিয়ে গেছে আগেকার সেই আত্মবিশ্বাস। কিলখানায় বাস থেকে নেমে যাওয়া পর্যন্ত তাই যেন বলে গেল সাহাবুদ্দিন।

With Best Compliments From :

Universal Marketing

Sales & Service of Laboratory & Scientific Instruments,
Power-Conditioning Equipment,
IT & Office-Products & General Order Supplier

H.O.: [illegible]4A, Sarat Ghosh Garden Road
Kolkata 700 031
Phone: 2415 9878 Mobile: 98301 68476

দিনান্তে সমকাল খিলানের বাঁকে সুচিরাকে

সরিৎ শর্মা

এ-পথে, সুচিরা!... এসো... আমাদের মাথার আকাশ, দ্যাখো, সীসার সন্ধ্যার মতো আধূসর ম্লান...
ওর অনাদ্যন্ত খিলানের ভাঁজে ভাঁজে নিরন্ত সময় কেবলই এ-গ্রহ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ছেড়ে যাচ্ছে নবতর আলোর উৎস খুঁজে আকাশতরতে...
কালের বুদ্‌বুদ্‌গুলো অবিরাম বিস্ফোরণে হয়তো অজস্র নিযুত সৌরমণ্ডলে
অন্যতর মহাদিগন্তের খোঁজে উল্কাগতিবেগ...
বিন্দু বিন্দু তুমি-আমি প্রেক্ষিতের খণ্ড খণ্ড সীমা এঁকে কতবার চলেছি ক্রমেই কাল-কালান্তর নীড়ের মায়ায়...
আয়ুজের শাখা-প্রশাখায় ক্রমচেতনার মহানদী কেবলই বিস্তৃত কোন্ মোহানায় চলেছে কে জানে...
তটে তটে কত না নামের স-র-গ-ম-এ বাঁধা দ্রুত-বিলম্বিত-এ
তাল ফেরতা ইতিহাসে... দেশ-দেশান্তর কিংবা সামাজিক... আ-উৎসকালিক...

সুচিরা, এখন ক্লান্ত দুজনেই! ... আমাদের সমকাল খিলানের বাঁকে
অবিচ্ছিন্ন হাত রাখো হাতে... মধ্যবর্তী প্রবেশ-প্রস্থান-ক্রমে এবারের ঘরে ফেরা লগ্ন এসে গেছে
মগ্ন হতে মুখোমুখি নিভৃত সংলাপে দুজনার... অবসন্ন অন্ধকারে
প্রথম চোখের আলো ভালোবাসা-মণিদীপ জ্বেলে
যুগ্ম মেধা-প্রজ্ঞার পরমে দীপ্ত এপিটাফ লিখে যেতে হবে
আরও এক দিনান্তের অবসানে

বহুদূর আসা হল... শান্তির সান্ত্বনা কই... মানুষ রাখবে তার কোন্ উত্তরাধিকার!
নিজেরই সৃষ্টির তেজে ধ্বংসের আগুনে পোড়ে... নিজেই নিয়তি সে আত্মহননের...
(নিজেরই আঘাতে খোঁড়া ক্রাচে-ভর সভ্যতা কি সূর্যাস্তের দীর্ঘ প্রেতচ্ছায়া
ফেলে ফেলে একা হাঁটছে কাঁটা-তার পার হতে প্রতিবন্ধী সৈনিকের মত!)
প্রতিদিন ধর্ম নেয় রক্ত স্বাদ উন্মাদ খুনের চক্রে রামে-রামে রহিমে-রহিমে-রামে 'কেইন্'-এ বা ব্রাদার অ্যাবেলে...
করুণ শূন্যতা বুকে স্ট্যাণ্ডের জ্যোৎস্না-আঁধারে বেকার যৌবন কাঁদে উৎকট উল্লাসে...

এই সংখ্যায় বারোমাসের ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হলো।

সম্পাদক : অশোক সেন

যুগ্ম সম্পাদক : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

এই সংখ্যার সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন
শঙ্খ ঘোষ সৌরীন ভট্টাচার্য

তত্ত্বাবধান : স্বপন পান
বুলবুল সামন্ত

গৌতম হালদার কর্তৃক 'আজকাল সমিতি'র পক্ষে 'বারোমাস কার্যালয়, ৬৩ সি মহানির্বাণ রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯ থেকে প্রকাশিত এবং 'কোলাজ', ২০ নবীন সরকার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

ঘোষণাপত্র চার নং

১।	প্রকাশনার স্থান	:	কলকাতা
২।	প্রকাশনার ক্রম	:	ষান্মাসিক
৩।	মুদ্রকের নাম	:	গৌতম হালদার
	ভারতীয় নাগরিক কিনা	:	ভারতীয় নাগরিক
	বিদেশী হলে মূল দেশ	:	
	ঠিকানা	:	২০ নবীন সরকার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৩
৪।	প্রকাশকের নাম	:	গৌতম হালদার
	ভারতীয় নাগরিক কিনা	:	ভারতীয় নাগরিক
	বিদেশী হলে মূল দেশ	:	
	ঠিকানা	:	২০ নবীন সরকার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৩
৫।	সম্পাদকের নাম	:	অশোক সেন
	ভারতীয় নাগরিক কিনা	:	ভারতীয় নাগরিক
	ঠিকানা	:	৬৩সি মহানির্বাণ রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯
৬।	পত্রিকার মালিক এবং অংশীদার বা মোট পুঁজির এক শতাংশের অধিকের স্বত্বাধিকারী নাম এবং ঠিকানা		আজকাল সমিতি, ৬৩সি মহানির্বাণ রো কলকাতা ৭০০ ০২৯

আমি গৌতম হালদার এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বর্ণনাবলী আমার জ্ঞান এবং বিশ্বাসমতে সত্য।

গৌতম হালদার
প্রকাশকের স্বাক্ষর